بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষণীয় গল্প-কাহিনী তুলে ধরেন যা আমি বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করে আসছি। আজও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, **'খোদা তা'লা যখন কাউকে দন্ডায়মান করেন অথবা যখন নবীদের প্রেরণ করেন তখন তিনি তাদের সাহায্য এবং সমর্থনও করে থাকেন। আর সত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকেও যদি তাদের অপকর্মের জন্য শাস্তি দিতে চান তাহলে শাস্তি দেন, ভ্রুক্ষেপ করেন না'**। এই প্রেক্ষাপটে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শৈশবে আমাদের গল্প শোনার সুগভীর আগ্রহ ছিল। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করলে তিনি আমাদের এমন সব গল্প বলতেন যা শুনে শিক্ষা অর্জন হয়। সেসব কাহিনীর মাঝে একটি কাহিনী এখন আমার মনে পড়ছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে আমি শুনেছি। তিনি (আ.) বলতেন, হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগে এ কারণে প্লাবন এসেছিল যে, মানুষ তখন চরম নোংরামিতে লিপ্ত ছিল আর পাপাচারে ছিল জর্জরিত। ক্রমাগতভাবে তাদের পাপের মাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের মূল্যও হারিয়ে যেতে থাকে। এটি একটি কাহিনী। কোন পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ ছিল। সেই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা। সেই বাসায় ছিল এক চড়ুই ছানা । সেই ছানার মা কোন জায়গায় গিয়েছে কিন্তু কোন কারণে আর ফিরে আসতে পারেনি। হয়তো মারা গিয়ে থাকবে বা অন্য কোন কারণে তার ফিরে আসা হয়নি। এই চড়ুই ছানার পিপাসা লাগে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে সে নিজের মুখ খুলতে থাকে। এটি দেখে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশ্তাদের নির্দেশ দেন, যাও পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ কর আর এত পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ কর যেন সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৃক্ষস্থ পাখির বাসা পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়, যাতে সেই চড়ুই ছানা পানি পান করতে পারে। ফিরিশ্তারা বলে, হে আল্লাহ্! সেই পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে গেলে সারা পৃথিবীই তলিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দেন, **আমি পৃথিবীর ভ্রুক্ষেপ করি না, এখন আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষের ততটাও মূল্য নেই যতটা এই চড়ুই ছানার রয়েছে।**

অতএব যদিও এটি একটি কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীতে শিক্ষণীয় দিক হলো, সত্য এবং সততা বিবর্জিত গোটা বিশ্বের সবাই সম্মিলিতভাবেও খোদার দৃষ্টিতে ততটা মূল্যও রাখে না যতটুকু এক

চড়ুই ছানার রয়েছে। অতএব আজ এই কাহিনী থেকে আমরা যেখানে একথা শিখতে পারি যে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত সেখানে আমাদের নিজেদেরও আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি ধর্মকে জাগতিকতা বা পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য, নিজেদের আভ্যন্তরীণ পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করার জন্য এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কালের প্রবাহে আমাদের উন্নতির পরিবর্তে যদি অবনতি হয়, আমরা যদি অধঃপতনের দিকে যাই তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ব। এমন পরিস্থিতিতে খোদাও আমাদের প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না। অনুরূপভাবে একথাও কারো অজানা নয়, আজ পৃথিবীর অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। বহু দেশে সরকার এবং জনসাধারণের কেউই পরস্পরের অধিকার প্রদান করে না এবং সেখানে অশান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজমান রয়েছে। যেখানে বাহ্যতঃ অশান্তি এবং নৈরাজ্য দেখা যায় না বা অবস্থা যেখানে খুব একটা অধঃপতিত বলে মনে হয় না সেখানেও খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে, মানুষ শুধু খোদা থেকে দূরেই যাচ্ছে না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে এবং অপলাপ করে তাঁর অবমাননা করা হচ্ছে একইসাথে নোংরামিতে তারা এতটাই নিমজ্জিত হচ্ছে যে, অস্বাভাবিক কার্যকলাপ বা চরিত্র বিবর্জিত কার্যকলাপকে আইন পাশ করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। বরং বলা হয়, যারা এসব নোংরা কাজের সমর্থন করে না আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অপরাধি। ভূমিকম্প, ঝড়, তুফান, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং প্রবল বর্ষণ যে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে রেখেছে এর কারণ হলো, পাপ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটি কেবল সতর্কবাণী মাত্র, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সাবধান করছেন। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীদের কাঁধে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করার এবং একথা বলার গুরুভার বর্তায় যে, তারা যদি সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক ধ্বংসাত্মক বিপদাপদ পৃথিবীতে নাযিল করতে পারেন। পৃথিবীবাসী কান্ডজ্ঞান খাটাবে, এ দোয়াই আমাদের আল্লাহ্র কাছে থাকবে।

এরপর আমরা দেখি, আজকালকার বরং চিরাচরিত রীতি যা চলে আসছে তাহলো, মানুষ নিজের অধিকার দাবি করে, এর ফলে অন্যের যত ক্ষতিই হোক না কেন। এ সম্পর্কে একজন প্রকৃত মুসলমানের চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা এ বিষয়ে সর্বোত্তম পথের দিশারী। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন, একজন সাহাবী নিজের ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য একজন সাহাবীর কাছে নিয়ে যান আর দৃষ্টান্তস্বরূপ এর মূল্য নির্ধারণ করেন দু'শত রুপি। দ্বিতীয় সাহাবী তখন বলেন, আমি এত কম মূল্যে এ ঘোড়া ক্রয় করতে পারি না কেননা এর মূল্য এরচেয়ে বেশী। সেই সাহাবী বিক্রেতা সাহাবীকে বলেন, ঘোড়ার বাজারদর সম্পর্কে আপনি মনে হয় অবহিত নন। কিন্তু ঘোড়ার মালিক সাহাবী এরচেয়ে বেশি মূল্য নিতে অস্বীকার করেন, তিনি বলেন, আমার ঘোড়ার মূল্য যেখানে এর বেশি নয় সেখানে আমি কেন এর চেয়ে বেশি মূল্য গ্রহণ করবো। এটি নিয়ে তাদের মাঝে বিতর্ক হতে থাকে। অবশেষে তারা

শালিসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করান। এটি ছিল সেই ইসলামিক চেতনা এবং প্রেরণা যা এই দু'জন সাহাবী প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অধিকার নেয়ার পরিবর্তে বা অধিকার দাবি করতে গিয়ে নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। এই চেতনাবোধ জাগ্রত হলে হরতাল বা ধর্মঘট আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর এই বক্তৃতার সময় স্ট্রাইক বা ধর্মঘট চলছিল। তিনি বলেন, নূন্যতম নেকী হলো, কারো পক্ষ থেকে যখন অধিকারের প্রশ্ন উঠে তখন তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করা উচিত। এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকার যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করছি, ভোগ করছি, আর একে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে গড়ে উঠেছে তাই অন্যের প্রাপ্য আমরা তাকে দিতে পারি না। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি রীতি যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী। আজকালকার উন্নত বিশ্বেও হরতাল বা ধর্মঘটের অধিকার দেয়া হয়েছে, তারাও কান্ডজ্ঞান না খাটিয়েই এর প্রয়োগ করে আর এই চিন্তা করে না যে, এর সীমা-ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজকাল যুক্তরাজ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছে যার ফলে রোগীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। নিজেদের অধিকার আদায়ের নামে রোগীদের শুধু চিকিৎসা সুবিধা থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, এবারকার জাপান সফরের সময় খুবই ভদ্র একজন খ্রিস্টান পার্দ্রি আমাকে প্রশ্ন করেন, শান্তির সংজ্ঞা কী? কীভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়? আজ পর্যন্ত আমি এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইনি, আমি তাকে বললাম, আমি পূর্বেও একথা বলেছি, **ইসলাম বলে যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। যদি এমনটি কর তাহলে তোমরা পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। আর অধিকার যদি এভাবে নিশ্চিত কর তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, এভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে।** তিনি বলেন, **এই সংজ্ঞা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে যা আমি প্রথমবার শুনেছি।**

অতএব আজ কেবল ইসলামই সকল বিষয়ে সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ছাড়া আমরা জগদ্বাসীকে কোনভাবেই মানাতে সক্ষম হব না। অন্যের অধিকার কুক্ষিগত করার তো প্রশ্নই উঠে না। আমরা যদি নিজেদের বৈধ অধিকার ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই কেবল তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এমনটি করা উচিত। আমরা বৈধ অধিকারও যদি ছেড়ে দেই তাহলে কিছুই যায় আসে না। যদি এমনটি হয় অর্থাৎ সমাজে যেহেতু উভয় পক্ষ থেকে অধিকার প্রদানের চেষ্টা থাকবে তাই দ্বিতীয় পক্ষও মু'মিন হওয়ার কারণে অবৈধভাবে অন্যের অধিকার পদদলিত করার চেষ্টা করবে না, হতেই পারে না যে, সে অবৈধভাবে অধিকার কুক্ষিগত করবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক সময় আমাদের কাযা বা বিচার বিভাগে এমন অনেক মোকদ্দমা বা মামলা আসে যে, ভাই-ভাইয়ের অধিকারকে পদদলিত করে বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারকে তারা কুক্ষিগত করে। আমরা যদি এদিকে

মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের বিচার বিভাগের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের জন্য ইসলাম কি শিক্ষা দেয়, ইসলামী চিন্তা চেতনা কেমন হওয়া উচিত, সাহাবীদের কেমন আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে? ইতিহাসে উল্লেখ আছে, একবার হযরত ইমাম হাসান এবং হোসেন (রা.)-এর মাঝে কোন বিষয়ে বিতর্ক হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটেই থাকে বা বিতর্ক হয়ে যায়। প্রকৃতিগতভাবে হযরত ইমাম হাসান খুবই শালীন ও কোমলমতী ছিলেন কিন্তু হযরত ইমাম হোসেন-এর স্বভাবে আবেগপ্রবণতার প্রাধান্য ছিল। তাদের মাঝে যে বাকবিতন্ডা বা ঝগড়া হয় তাতে হযরত ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে অধিক কঠোরতা প্রদর্শিত হয় কিন্তু হযরত ইমাম হাসান ধৈর্য প্রদর্শন করেন। সেই বাকবিতন্ডার সময় অন্যান্য সাহাবীরাও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঝগড়া যখন শেষ হয়, পরবর্তী দিন একজন দেখেন যে, হযরত ইমাম হাসান খুব দ্রুত পায়ে কোন দিকে ছুটে যাচ্ছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম হাসান বলেন, আমি হোসেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলেন, আপনি কেন ক্ষমা চাইতে যাচ্ছেন? ঝগড়ার সময় আমিও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আমি জানি হোসেন আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। আপনার তার কাছে নয় বরং তার আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত ইমাম হাসান বলেন, আপনি ঠিক বলছেন, আমি ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি এই জন্য যে, এক সাহাবী আমাকে বলেছেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, দু'জনের মাঝে যখন ঝগড়া হয় তখন তাদের মাঝে যে প্রথমে মিমাংসার হাত বাড়ায় সে দ্বিতীয় জনের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি শুনে আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, গতকাল আমি হোসেনের কঠোর ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছি, তিনি আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। এখন হোসেন যদি আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে এসে যায় আর মিমাংসা করেন তাহলে উভয় জগতেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। এখানেও আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো আর পরকালেও আমি পিছিয়ে থাকলাম। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি, যেই কঠোর ব্যবহারের সম্মুখীন আমি হয়েছি তাতো হয়েছি-ই, এখন আমি তার কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিব যেন এর বিনিময়ে তার পাঁচশ' বছর পূর্বে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি। অতএব এহলো সেই মনমানসিকতা যা আমাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত বা জাগ্রত হওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি কৌতুক শুনেছি যা মোকামাতে হারীরি বা অন্য কোন গ্রন্থ হতে নেয়া একটি কাহিনী। তিনি (আ.) বলতেন, কোন জায়গায় কোন একজন অতিথি গোসল করতে যান। হামামের মালিক অতিথিদের সেবার জন্য বিভিন্ন চাকর-বাকর নিয়োজিত রেখেছিলেন। সেসব দেশে এমন হামাম বা স্নানাগার থেকে থাকে যেখানে অতিথিদের মালিশ করার জন্য সেবকদের ব্যবস্থা থাকে যারা মানুষকে গোসলও করায়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে তখন হামামের মালিক সেখানে উপস্থিত ছিলো না। মেহমান যখন গোসল করার জন্য হামামে প্রবেশ করে তখন সব সেবক একত্রে এসে তার সাথে চিমটে যায়।

মাথা যেহেতু সহজেই মালিশ করা সম্ভব তাই সবাই একসাথে তার মাথা মালিশ করতে আরম্ভ করে। একজন বলে, এটি আমার মাথা, দ্বিতীয় জন বলে, না আমার মাথা। এভাবে একথা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। তখন একজন আরেকজনকে ছুরিকাঘাত করে যারফলে সে আহত হয়। হৈ-চৈ এর ফলে পুলিশ আসে। অবশেষে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতেও একজন চাকর বলে, এটি আমার মাথা আর দ্বিতীয় জন বলছিল, এটি আমার মাথা ছিল। যে গোসল করতে গিয়েছিল আদালত তাকে জিজ্ঞেস করে। তখন সে বলে, হুযূর! এদের তো মাথা নেই অর্থাৎ কোন বোধবুদ্ধি নেই। এদের কথা শুনে আমার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনিও আমাকে একই প্রশ্ন করলেন। অথচ মাথা এরও নয় আর ওরও নয় মাথা তো ছিল আমার।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টান্ত এজন্য দিতেন যে, এই ইহজাগতিক ঝগড়া-বিবাদ অর্থহীন। আমারই বা কী আর তোমারই বা কী, গোলাম বা দাস তো কিছুই নয়, সে যখন আমি আবদুল্লাহ্ হওয়ার দাবি করে তখন এর অর্থ হয়, এখন তার নিজের আর কিছুই নেই। একজন প্রকৃত মুসলমানের আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আর এই ঘটনা সেই প্রেক্ষাপটেই তিনি বর্ণনা করছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকে সে আমার এবং তোমার প্রশ্ন উঠায় না, সে তো খোদা তা'লার বান্দা হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ্ যে হয় তার নিজের বলতে কিছুই থাকে না, সব খোদা তা'লার হয়ে থাকে। সে যখন প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, আব্দুল্লাহ্ যখন হয়ে যায় তখন সে বলে, সবকিছু আল্লাহ্‌র। এখন তার নিজের যেহেতু আর কিছুই নেই তাই এরপর আমার এবং তোমার এই বিতন্ডার বা বিতর্কের আর সুযোগ থাকে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করে দেখ! এতে মহানবী (সা.)-এর নামও আব্দুল্লাহ্ রাখা হয়েছে। যেভাবে কুরআনে বলা আছে 'لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ' (সূরা আল্ জিন্ন: ২০)। অতএব আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে আমাদের নিজেদের আর কিছুই থাকে না, সবই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমরা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছি। এখানে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই প্রাণ শব্দের অধীনে চলে আসে আর বাকি সব ধন-সম্পদ আসে মাল শব্দের অধীনে। মানুষ এই দু'প্রকার জিনিসেরই মালিক বা সত্ত্বাধিকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এই উভয় জিনিস মানুষের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি, তাদের প্রাণও নিয়েছি আর সম্পদও। এর অর্থ হলো, তোমাদের মাঝে এ মর্মে ঝগড়া-বিবাদ থাকা উচিত নয় যে, এই জিনিসটি আমার বা সেই জিনিসটি তার, এই বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ো না কেননা; এখানে আমার তোমার বলার কোন সুযোগ নেই। তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা কর আর এসব বিতর্ক ছেড়ে দাও যে, অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট হলেন অমুক ব্যক্তি কেন হলেন না। এখানে নির্বাচনের কথা হচ্ছে, ওহদাদারদের কথা বলা হচ্ছে। অনেকেই এই ঝগড়া আরম্ভ করে যে, অমুক ব্যক্তি কেন নামাযের ইমাম নিযুক্ত হলো, আমরা তার পিছনে নামায পড়ব না বা অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলো, অমুক কেন হয়নি? অমুক কেন সেক্রেটারী মনোনীত হলো আমি কেন হলাম না বা

যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি ইমাম না হবেন আমরা অমুকের পিছনে নামায পড়তে পারি না। এ কথাগুলো কেবল শোনার জন্য নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে এমন মানুষ ছিল, বর্তমান যুগে আর এমন মানুষ নেই। আজও এমন অভিযোগ এসে থাকে। সেযুগে সাহাবীরাও জীবিত ছিলেন যারা এমন বক্র প্রকৃতির লোকদের সংশোধন করতেন। কিন্তু আমরা নবুওয়তের যুগ বা নবীর যুগ থেকে এখন ক্রমশঃ দূরে যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে এই দুরত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই এদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। পূর্বেও এ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, আমাদের অনেক সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের একথা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারি, কীভাবে নিজেদের হঠকারিতা এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে পারি? নির্বাচনের সময়ও এমন প্রশ্নাবলী উঠে থাকে। যখন কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্নের অবতারণা করে। এই বছরটি আমাদের জামাতে নির্বাচনের বছর। এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবার উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের নির্বাচনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত করুন। অঙ্গ সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র আসে, অমুককে কেন মনোনীত করা হলো, অমুককে কেন করা হলো না, সে এমন বা তার ভেতর অমুক অভ্যাস রয়েছে। অতএব এমন আজেবাজে চিন্তাধারা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। একটি নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের জন্য যার অনুকূলেই মঞ্জুরী দেয়া হয় তার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত বা সবার পূর্ণ সহযোগিতা তার প্রতি থাকা উচিত।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মু'মিনের উচিত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করা এবং বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো। কর্মকর্তা হোক বা কোন ওহদাদার হোক অন্যদের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে অর্থাৎ কর্মকর্তারা যেন কেবল অধীনস্তদের ওপরই নির্ভর না করেন বরং তাদের নিজেদেরও সরাসরি সব কাজের নিগরানী এবং তত্ত্বাবধান করা উচিত, কাজে জড়িত থাকা উচিত, তাহলেই কাজ সঠিকভাবে সমাধা হওয়া সম্ভব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার বিশাল এক লঙ্গরখানা ছিল। গরীবদের একটি বিশাল শ্রেণী প্রতিদিন সেখান থেকে খাবার খেত কিন্তু বিশৃঙ্খলা ছিল এর সবচেয়ে বড় একটি বিপত্তি। সে ব্যক্তি সম্পদশালী ছিল কিন্তু তার মাঝে নিগরানী বা দেখাশুনার মনমানসিকতা ছিল না বা সেদিকে দৃষ্টি দিত না। কর্মচারীরা ছিল অসৎ ও দুর্নীতিবাজ। যারা বাজার করতো তারা দামী জিনিস নিয়ে আসতো আর পরিমাণে কম আনতো। আর ব্যবহারকারীরা কিছুটা নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত। যারা খাবার রান্না করতো তারা কিছু নিজেরা

খেয়ে ফেলতো, কিছুটা আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতো আর কিছুটা এদিক-সেদিক নষ্ট হতো। অনুরূপভাবে স্টোর রুম খোলা থাকতো আর সারা রাত কুকুর এবং খেকশিয়াল সেসব খাদ্যসামগ্রী খেতো এবং নষ্ট করতো। ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, সেই ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে আর বিশ বছরের বিশৃঙ্খলার পর তাকে জানানো হয় যে, তুমি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছ। সে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে উদার ছিল তাই সে লঙ্গরখানা বন্ধ করতে চায়নি। কিন্তু ঋণ পরিশোধের চিন্তাও তার ছিল। সে পরামর্শের জন্য তার বন্ধু-বান্ধবদের ডাকে। সে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা তাদেরকে কিছুই বলেনি আর কেউ বলেও না। সে সবাইকে বলে, আমি ঋণী হয়ে পড়েছি। তারা সবাই বলে, স্টোররুমের কোন দরজা নেই, সারারাত খেকশিয়াল এবং কুকুর খাদ্য-দ্রব্য এবং খাদ্রসামগ্রী ইত্যাদি নষ্ট করতে থাকে তাই অনেক জিনিস নষ্ট হয়। স্টোরে যদি দরজা লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে অনেকটা সাশ্রয় হওয়া সম্ভব। সে দরজা লাগানোর নির্দেশ দেয় আর দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি কাহিনী মাত্র আর কাহিনীতে কুকুর-শিয়াল ও অন্যান্য প্রাণীরাও কথা বলে। বলা হয়, রাতের বেলা কুকুর এবং খেকশিয়ালরা স্টোররুমের দরজা বন্ধ দেখে এবং অনেক হৈ-চৈ বা হট্টগোল করে। হঠাৎ বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কোন কুকুর বা শিয়াল সেখানে আসে আর জিজ্ঞেস করে, তোমরা হৈ-চৈ কেন করছো? অন্যরা উত্তর দেয়, স্টোররুমে দরজা লাগানো হয়েছে, এখন আমরা খাব কোত্থেকে? আমাদের এলাকার সব কুকুর ও খেকশিয়াল এখান থেকেই খাবার খেতো। সে বলে, তোমরা অনর্থক কান্নাকাটি করছ, হৈ-চৈ করছো আর সময় নষ্ট করছো। যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত নিজের ঘর লুটপাট হতে দেখেছে এবং সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেয়নি তার স্টোরের দরজা কে বন্ধ করবে? সে নিজে তো আর এর তত্ত্বাবধান করবে না তাই চিন্তার কিছু নেই।

এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ‘যদি চায়’ এবং সত্যিকার অর্থে ‘চাওয়ার’ মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। কুকুর এবং খেকশিয়ালরা হৈ-চৈ করে যে, যদি ‘সে চায়’ আর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে খাব কোত্থেকে? আর এদের মাঝে যে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক নেতা ছিল সে বলে, এই সম্পদশালী ব্যক্তি এদিকে মনোযোগই দিবে না, সে চাইবেই না, তাই হৈ-চৈ করার কী আছে? এটি বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জামাতের সদস্যরা যদি না চায় তাহলে কিছু হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তারা যদি চায় তাহলে অনেক কঠিন কাজও স্বল্পতম সময়ে সমাধা করতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের শৈশবের বিভিন্ন কাহিনীর মাঝে আলাদিনের প্রদীপের কাহিনীও অনেক প্রসিদ্ধ। আলাদিন এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, তার একটি প্রদীপ হস্তগত হয়, সে যখনই সেই প্রদীপে ঘর্ষণ করত এক দৈত্য সামনে আসত, এটি শিশুদের একটি কাহিনী, সেই দৈত্যকে সে যা-ই বলত সে তাৎক্ষণিকভাবে তার সামনে তা হাজির করত, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে তাকে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিলে সে নিমিষেই রাজ প্রাসাদ এনে হাজির করতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা সেই সময় মনে করতাম, আলাদিনের প্রদীপের ঘটনা একটি সত্য ঘটনা কিন্তু বড় হলে আমরা বুঝতে পারি, এটি শুধু কাল্পনিক একটি গল্প বা কল্পকাহিনী। কিন্তু যৌবন পেরিয়ে যখন

বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করলাম তখন বুঝতে পারলাম, এই কথা সঠিক। এখানে বসে অনেকেই হয়তো চিন্তা করবে, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কীভাবে বলছেন যে, এটি সঠিক। আলাদিনের প্রদীপ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু সেই প্রদীপ তেলের প্রদীপ নয় বরং তা দৃঢ় সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ হয়ে থাকে। খোদা তা'লা যাকে সেই প্রদীপ দান করেন সে সেই প্রদীপকে কাজে লাগায় আর যেহেতু সংকল্প এবং প্রত্যয় খোদা তা'লার গুণাবলীর অন্তর্গত বিষয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা 'কুন' বললে কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে তাঁর নির্ধারিত নীতির অধীনে তাঁর নির্দেশাবলী মান্য করে, (এগুলো হলো শর্ত) তাঁর কাছে দোয়া করে, তাঁর সাহায্য যাচনার মাধ্যমে কোন মানুষ যদি 'কুন' বা হও বলে তাহলে তা হয়ে যায়। এক কথায় শৈশবে আলাদিনের প্রদীপে আমরা বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু যৌবনে আমাদের সেই ধারণা কিছুটা দোদুল্যমান হয় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর বুঝতে পেরেছি, আলাদীনের প্রদীপের কাহিনী সত্য কিন্তু এটি একটি রূপক ঘটনা আর সেই প্রদীপ পেতলের নয় বরং তা সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ, এতে যখন ঘর্ষণ করা হয় তখন কাজ যত বড়ই হোক না কেন স্বল্পতম সময়ে সেই কাজ সাধিত হয়।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা এমনই হওয়া উচিত যে, আমরা শুধুমাত্র 'যদি চাই' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকব না বরং আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে চাইতে হবে আর এর সাথেই নিজেদের সকল শক্তি সামর্থ উজাড় করে কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা চায়, অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চাওয়া সত্ত্বেও কাজ হয় না। তাদের সেই ইচ্ছা এবং চাওয়াতে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে না। এই চাওয়ার সাথে চাওয়ার যেসব অনুসঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থাকে না অর্থাৎ সংকল্প, প্রত্যয় থাকে না, পরিশ্রম করা হয় না, শুধু মনে মনে চায় আর চাওয়াই সার। উদাহরণ স্বরূপ আমি নামাযের বিষয়টা নেই, নামাযের প্রশ্ন যখন আসে, অনেকেই আমার কাছে এসে বলে, দোয়া করুন, আমরা নিয়মিত নামায পড়তে চাই কিন্তু আমরা রীতিমত নামায পড়তে পারি না। অন্য কাজ যখন চায় করে ফেলে কিন্তু নামায পড়তে চাইলেও যেহেতু অনিহার সাথে চায়, এর জন্য সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে না এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চায় না তাই নামাযের অভ্যাসও হয় না। এমন লোকদের চাওয়া আসলে না চাওয়ারই নামান্তর। হতেই পারে না যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে আর সে কাজ হবে না। নামায সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য একটি গৌণ বিষয়, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জাগতিক কাজ, সে কারণে নামাযের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটি কীভাবে সম্ভব যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে আর কাজ করার দৃঢ় সংকল্পও করবে অথচ সে কাজ হবে না? তাই আসলে মানুষের নিজেরই আলস্য ও অনিহাকেই অনর্থক চাওয়া আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে।

তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, আমরা শৈশবে একটি গল্প শুনতাম আর শুনে হাসতাম। অথচ হাসির জন্য নয় বরং ক্রন্দনের জন্য সেই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আর এতে বর্তমান যুগের মুসলমানদের চিত্র অংকন করা হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনী যিনি শুনিয়েছেন তিনি

ইঙ্গিতে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন যেন মৌলভী তার পিছু ধাওয়া না করে। কোন আহমদী যদি এমন কাজ করে তাহলে তাকেও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। সেই কাহিনীটি হলো কারো এক দাসী বা চাকরানী ছিল যে সেহরীর সময় রীতিমত উঠতো কিন্তু সে রোযা রাখতো। ঘরের গৃহকর্তী ভাবলেন, সে হয়ত কাজে সাহায্যের জন্য ওঠে। কিন্তু সে যেহেতু রোযা রাখতো না তাই ঘরের মালিক চিন্তা করেন, একে অনর্থক সেহরীর সময় কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন কী? সেই সময়ের কাজ আমি নিজেই করব। দু'চার দিন পর সেই ঘরের মালিক বলেন, তুমি সেহরীর সময় উঠো না, আমি নিজেই এ সময়ের কাজ সেরে নিব, তোমার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। একথা শুনে সেই মেয়ে বিস্ময়ের সাথে গৃহকর্তীর দিকে তাকায় এবং চিন্তা করে, বলছে কী? সেই মেয়ে বলে, বেগম সাহেবা! আমি নামায পড়ি না, রোযাও রাখি না, যদি সেহরীও না খাই তাহলে কী কাফির হয়ে যাব না? সত্যিকার অর্থে এটি প্রতীকি ভাষায় সেসব লোকের অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছে যারা নামায পড়ে না। তিনি বলেন, (জুমুআতুল বিদার প্রেক্ষাপটে এটি বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক জুমুআ এবং প্রত্যেক নামাযের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য) তুমি অন্য ভাষায় এটি বলতে পার, যদি কোন মুসলমানকে বলা হয়, মিঞাঁ জুমুআতুল বিদা পড়ে লাভ কি, কেন নিজেকে কষ্ট দাও এ বাহানায়? বছরের অন্যান্য জুমুআ যেহেতু পড়নি তাই এই জুমুআও পড়ার দরকার কী? তখন সে বিস্ময়ের সাথে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে, ভাইজান, আপনি বলছেন কী? আমি প্রাত্যহিক নামাযের জন্য মসজিদে যাই না, রোযাও আমি রাখি না, জুমুআতুল বিদাও যদি না পড়ি, তাহলে কী কাফির হয়ে যেতে বলছেন? অতএব একবেলা মসজিদে এসে নামায পড়া আর মনে করা যে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে নিলাম, এটি একটি হাস্যঙ্কর বিষয়। এটি তাদের জন্য, যারা মনে করে মসজিদে গিয়ে এক বেলার নামায পড়লেই তার ফরয দায়িত্ব পালন হয়ে গেল আর এটিই যথেষ্ট। অতএব যারা রীতিমত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না তারা এমন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। পাঁচবেলার নামায প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে বা জামাতের সাথে নামায পড়া আবশ্যক, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যদি এটি বল, আমরা সাবালক নই বা আমাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এই উভয় কারণের কোনটি যদি না থাকে তাহলে সব জায়গায় বা সর্বত্র জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিজেই শুনেছি আর হুযূরের রচনাবলীতেও এই কাহিনী দেখা যায়। কোন বাদশাহ্ বা সম্পদশালী ব্যক্তি যখন কোন স্থানে যায় তার আর্দালী বা পিয়নও সাথে যায়। সে যেহেতু তখন সাথেই থাকে তাই তার ভেতরে যাওয়ার জন্য পৃথক অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আজকালও দেখুন! যখন মন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আসে তখন প্রটোকল কর্মকর্তা বা তার অধীনস্ত কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষীরা সবাই তার সাথে যায় এজন্য পৃথক কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সেযুগে ভারতে বা পাকিস্তানে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল এবং সেসব অঞ্চলে ভাইসরয় নিযুক্ত

করা হতো। ভাইসরয় যদি কোন গভর্ণরকে তলব করেন তখন আর্দালি কোন নিমন্ত্রণ না থাকলেও সে গভর্ণরের সাথেই যাবে আর তার নিরাপত্তা রক্ষী এবং সেবকরাও সেই দাওয়াতে যোগ দিবে বা অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে তোমাদের অবস্থা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন যদি ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর তাহলে তারা যেখানেই যাবে তোমরা তাদের সাথে যাবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে তাঁর ফিরিশ্‌তাদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠবে আর তোমরা তাঁর আর্দালি বা সহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা যদি মানুষের হৃদয় ও মনমস্তিষ্কে প্রবেশ করে তোমরাও তাদের সাথে যাবে। তিনি (রা.) বলেন, এই অসাধারণ শক্তিকে বোঝার চেষ্টা কর যা খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের শক্তি আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্ক রাখে, তোমরা একে দৃঢ় করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের সাথে যত বেশি সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় গড়ে তোলো যেন মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি অর্জন করতে পার। যদি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি অর্জন হয় তাহলে সকল পর্দা ছিন্ন হবে আর খোদার নূর বা জ্যোতি যেখানে পৌঁছবে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জলসায় আগমনকারীদেরকে তখন নসীহত করেন, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও। যে আগ্রহ নিয়ে এখানে এসেছ তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা কর। এমনটি যেন না হয় যে, নৌকা দেখার জন্য কিছু মানুষ যেভাবে প্রথমে এসে যায় তোমাদের আগমন যেন তদ্রুপ না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলো। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার ফলে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এই আধ্যাত্মিকতা তখন মানুষের মনমস্তিষ্কে যেই প্রভাব ফেলবে এর ফলশ্রুতিতে তোমাদের কাজ ফিরিশ্‌তারাই করবে। যেখানেই তারা পৌঁছবে সেখানে তোমাদের নামও পৌঁছাবে। কেননা তোমাদের উদ্দেশ্য নেক, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তোমরা উন্নত আর তোমাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

অতএব এই মৌলিক নীতিকে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যখন কোন জায়গায় সমবেত হই, তা জলসা হোক বা ইজতেমা, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যখন আমরা সমবেত হই সেখানে আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের সকল চেষ্টা করা উচিত। আপনাদের বৈঠক বা মজলিস যেন সাময়িক আধ্যাত্মিক বৈঠক না হয় বরং তাতে যেন স্থায়ী আধ্যাত্মিক বৈঠকের পরিবেশ এবং প্রভাব থাকে, আর ফিরিশ্‌তারাও যেন আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। যেখানে আমরা চেষ্টা করব সেখানে ফিরিশ্‌তারা এসে যেন প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, সত্যিকার মু'মিন সে, যে সৎকাজ করে। সৎকাজ করলে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনয় এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার কাছে অধিক নেক কর্মেও সামর্থ লাভের জন্য দোয়া করা উচিত এবং একজন মু'মিন তাই করে থাকে, যেন এই ধারা অব্যাহত থাকে আর তার পরিণাম শুভ হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কোন কোন সাহাবী বলেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)-কে দোয়া করতে দেখতাম তখন আমাদের এমন মনে হতো যেন একটি পাতিলে পানি টগবগ করে ফুটছে। অতএব নিজ প্রবৃত্তির সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর, পবিত্র হও। একথা মনে করো না বা ভেবো না যে, তোমরা নেক কাজ করছ, সবচেয়ে বড় নেক কর্মের ফলেও ঈমানহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, জানি না কেন আজকাল মানুষ হজ্ব করে আসে কিন্তু তাদের হৃদয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং পাপ দানা বাধে; এর কারণ হলো, হজ্বের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ এরা বোঝে না। আধ্যাত্মিকভাবে বিন্দুমাত্র লাভবান হওয়ার পরিবর্তে নিরেট হাজী সেজে অহংকার প্রদর্শন আরম্ভ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কাহিনী শোনাতেন যে, এক বৃদ্ধা শীতকালে রাতের বেলায় ষ্টেশনে বসে ছিলেন, কেউ তার চাদর নিয়ে যায়, তার যখন শীত লাগে সে চাদর গায়ে দিতে গিয়ে এটি দেখে চিৎকার করে বলে, ভাই হাজী আমার শুধু একটিই চাদর ছিল আমার প্রয়োজন আছে, সেটি ফেরত দাও। হাজ্জী পাশেই বসে ছিল, নিয়ে চলে যায় নি, নিয়ে যাওয়ার ছিল, একথা শুনে সে লজ্জিত হয় আর চাদর তাকে ফেরত দেয় এবং একই সাথে জিজ্ঞেস করে, যে চাদর চুরি করেছে সে যে একজন হাজী একথা তুমি কীভাবে জানলে? সেই মহিলা বলেন, এযুগে এমন পাষণ্ডতা হাজীরাই প্রদর্শন করতে পারে।

অতএব একথা ভেবো না যে, আমরা নেক কর্মে নিয়োজিত। একথা ভেবো না যে, আমরা পূতঃ-পবিত্র সংকল্প রাখি, মানুষ যত নেক কাজই করুক না কেন তা থেকেও পাপের সূচনা হতে পারে। মানুষের সংকল্প যতই নেক হোক না কেন তা তার ঈমানকে বিকৃত করতে পারে। ঈমান আমাদের কর্মের ফলে লাভ হয় না বরং খোদা তা'লার করুণার ফলে লাভ হয়। এটি একটি মৌলিক কথা যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের কর্ম যতই হোক না কেন খোদার দয়া যদি না হয়, তাঁর কৃপা যদি না থাকে, ঈমান কোনভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই সব সময় খোদার দয়া-মায়ার ওপর দৃষ্টি রাখো আর তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় তাঁর পবিত্র হাতের দিকে যায়। কেননা যে ভিখারী এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদার দ্বার পরিত্যাগের পর আমার জন্য অন্য কোন দ্বার খুলতে পারে না এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। অতএব তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় খোদার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে, কেননা যার চোখ খোদার সত্তার প্রতি নিবদ্ধ, যে খোদার পথপানে চেয়ে থাকে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। যখনই দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো হয় আর খোদার দরজা থেকে সে যদি চলে যায়, তার সংকল্প যতই নেক হোক না কেন, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন তার কোন ঠাঁই নেই বরং শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে সে আশ্রয় নেয়। তাই স্থায়ীভাবে তওবা, ইস্তেগফার, তাঁর কৃপারাজীর ভিক্ষা চাওয়া, তাঁর ফযল আকর্ষণ করা এসব বিষয়ই শুভ পরিণাম এবং পরিনতির দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে বা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে, আমার সঠিক মনে নেই, চুরির ঘটনা ঘটে, কোন গহনা চুরি হয়। তার এক চাকর ছিল, যে হৈ-চৈ করে উঠে যে, এমন দুর্ভাগাও কি পৃথিবীতে আছে যে আল্লাহ্‌র খলীফার ঘরে চুরি করতেও দ্বিধা করে না। যে চুরি করেছে, তাকে সে সীমাহীন অভিশাপ দিচ্ছিল আর বলছিল যে, আল্লাহ্ তার চুরি প্রকাশ করুন, তাকে লাঞ্ছিত করুন। অবশেষে তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায়, সেই গহনা এক ইহুদীর ঘরে বন্ধক রাখা হয়েছে। সেই ইহুদীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, এই গহনা কোথায় পেয়েছ? সে সেই চাকরের কথাই বলে যে হৈ-চৈ করছিল আর চোরকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

অতএব মৌখিকভাবে আনুগত্য করা বা অভিশাপ দেয়া কোন অর্থ রাখে না, আসল জিনিস হলো কর্ম। মৌখিকভাবে যে আনুগত্যের দাবি করে সে অনেক সময় সবচে বড় মুনাফিক বা কপটও হতে পারে। তাই এটি সত্যিই চিন্তার বিষয় আর এদিকে বা এই কথার প্রতি সবসময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় আহমদীয়াতের এক শত্রুর কথা উল্লেখ করেন যে কিনা বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিল যে, আমরা আহমদীয়াতকে পিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনি (রা.) বলেন, আমিও তাকে এই উত্তর দিতে পারতাম যে, তুমি পিষ্ট করে দেখাও। কিন্তু তা না করে আমি তাকে বলেছি, কাউকে নিশ্চিহ্ন করা বা না করা বা কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা স্থায়ীত্ব দেয়া এটি খোদা তা'লার নিয়ন্ত্রণে। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চান তাহলে আপনাদের চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি নিজেই নিশ্চিহ্ন করবেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তাক্বওয়াই মানুষকে এমন দাবি করা থেকে বিরত রাখে যে, আমি হেন করব, তেন করব, তাক্বওয়াই একথা বুঝায়। তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি এই উত্তর দিয়েছি যে, আমাদের কিছু করার কোন শক্তি নেই কিন্তু আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে স্থায়ীত্ব দিতে চান, প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তাক্বওয়াই মানুষকে এমন দাবি থেকে বিরত রাখে যে, হেন করব, তেন করব। এমন দাবি করে লাভ কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, কাদিয়ানে বা অন্য কোন স্থানে ভয়াবহ কলেরার প্রকোপ দেখা দেয়, এক জানাযার সময় একজন বলতে আরম্ভ করে, এরা নিজেরাই মরে। কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মানুষ তবু খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত হয়না আর পেট ভরে খায়, একথাও চিন্তা করে না যে, এটি এখন কলেরার সময়। যে একথা বলছিল, সে বলে, আমরা শুধু একটি ছোট চাপাতি বা রুটি খাই কিন্তু এই হতভাগারা পেটপুরে খায় এবং এরফলে কলেরায় মারা যায়। দ্বিতীয় দিন আরো একটি জানাযা আসে। কেউ জিজ্ঞেস করে, এই জানাযা কার? সেখানে মানুষ তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত ছিল, তখন 'এই জানাযা কার?' এই প্রশ্ন শুনে উত্তরে একজন বলে, এই জানাযা সেই ব্যক্তির যে শুধু একটি চাপাতি খায়। অতএব এমন দাবি করে লাভ কী যে, আমরা হেন

করব বা তেন কবর। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন, তা আমরা বলতে পারি, এমনটি হয়ে যাবে। বিনয়ের অর্থ এই নয় যে, খোদা যা বলেন তা গোপন করব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ' كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ' (সূরা মুজাদেলা: ২২) অর্থাৎ আমরা এটি অবধারিত করে রেখেছি যে, আমরা এবং আমাদের রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব। যদি কেউ আমাদেরকে বলে, আমরা তোমাদেরকে পিষ্ট করব তাহলে আমি বলতে পারি, আমার শক্তির যতটুকু সম্পর্ক আছে তাতে আমি কিছু বলতে পারি না কিন্তু এই শব্দ যদি আহমদীয়াত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এটি কখনও হতেই পারে না। আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের সে পরিমান বিশ্বাস রয়েছে যতটা আমাদের নিজেদের প্রাণের ওপরও নেই। অতএব আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আমাদের জীবদ্দশায় আসুক বা পরে কিন্তু এই বিজয় যাত্রায় শরীক হওয়ার জন্য আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যেন বংশপরম্পরায় এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের যুগে যদি বিজয় না আসে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সেই বিজয় দেখে।

দোয়া কীভাবে করা উচিত আর আহমদীরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন তা থেকে উত্তোরণ কীভাবে সম্ভব; এর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ সেটিই হয়ে থাকে যা মা তার পুত্রের সাথে বা সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করেন। প্রায় সময় মায়ের বক্ষের দুধ শুকিয়ে যায় কিন্তু বাচ্চা বা শিশু যখন ক্রন্দন করে তখন আবার দুধ নেমে আসে। অতএব যেভাবে শিশুর ক্রন্দন ছাড়া মাতৃবক্ষে দুধ আসতে পারে না অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও তাঁর রহমতকে বান্দার ক্রন্দন এবং আহাজারির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। বান্দা যখন আহাজারি করে রহমতের দুধ নাযিল হয় বা নেমে আসে। তাই আমি যেমনটি বলেছি, আমাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত কিন্তু সেই চেষ্টা নয় যা মোনাফিকরা করে থাকে। যত বেশি দোয়া করা যায় আমাদের করা উচিত। দোয়াকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তখন তাহরীক করেছিলেন যে, ৭টি রোযা রাখুন আর দোয়া করুন। কয়েক বছর পূর্বে আমিও জামাতকে রোযা রাখার কথা বলেছিলাম, নফল রোযা রাখা উচিত। জামাতে আজও কেউ কেউ এমন আছে যারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা রোযা রাখে। আমাদের এখন অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একটি করে হলেও বিশেষভাবে ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০টি রোযা রাখা উচিত। আর দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন, কেননা জামাত এখন যেই পরিস্থিতির সম্মুখীন, কোন কোন জায়গায় পরিস্থিতি কঠিনতর হচ্ছে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারী করি তাহলে যেভাবে শিশুর ক্রদনে মায়ের বক্ষে দুধ নেমে আসে তেমনিভাবে আমাদের স্বর্গীয় প্রভুর সাহায্যও

আকাশ থেকে নাযিল হবে আর সেসব প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা যা আমাদের পথে বিরাজমান তা দূর হবে। পূর্বেও দুরীভূত হয়েছে আর এখনও তা দুরীভূত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিছু সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূর করা আমাদের শক্তির উর্ধ্বে। শত্রুর মুখ আমরা বন্ধ করতে পারি না। তাদের কলমকে আমরা বাধাগ্রস্ত করতে পারি না। তাদের মুখ এবং কলম থেকে এমন কিছু বের হয় যা শোনা এবং পড়ার শক্তিও আমাদের নেই আর আজকাল আমরাদের চোখে পড়ে, পাকিস্তানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ছাপা হয় বা লাগানো হয় যার ভাষা চরম নোংরা। তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো অথচ তখন ইংরেজদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তখনও কথায় কর্ণপাত করা হতো না। তারা সেভাবেই শুনতো যেভাবে এক বধির শুনে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেসব কথা যা মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এখন বলা হয় তা অন্য কারো সম্পর্কে বলা হলে দেশে আগুন লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেসব কথা অবিরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয় কিন্তু যারা এমন কথা বলে তাদেরকে এতটুকুও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না। অথচ আমরা এই রিপোর্টও পেয়েছি, সেই যুগের কথা, কোন কোন বিরোধী পরিমন্ডলে একথাও বলা হয়, সরকারী কর্মকর্তারা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই লেখ, তোমাদের কিছুই বলা হবে না।

জামাতের সাথে সব সময় এমন ব্যবহার হয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মুখে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জামাত উন্নতি করে চলেছে। এটি সেই সরকারের অবস্থা ছিল যেই সরকার জামাতের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করেনি। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনও রয়েছে আর সেই আইন বিরোধীদের সাহায্যও করে থাকে আর তারা যা ইচ্ছে তাই করে। মুখে যা আসে, যেই অপলাপ করতে হয়, বাজে কথা বলতে হয়, মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তারা বলে। আহমদীদেরকে যুলুম এবং নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয় আর আদালতও এখন শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তারা শাস্তি দিয়ে থাকে। এর জন্য খোদার দরবারে অনেক বেশি আহাজারী এবং ক্রন্দনের প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিকে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ চিত্তে আর একনিষ্ঠভাবে খোদা তা'লার দরবারে ঝুঁকুন, নফল পড়ুন, সদকা দিন, রোযা রাখুন। দোয়া ছাড়া এবং খোদার রহমতকে আহ্বান করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

আল্লাহ্ তা'লা সেসব আহমদীকে, যেখানে যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে বা যেসব দেশে হচ্ছে বা যেসব স্থানেই এই যুলুম এবং অত্যাচার আর নির্যাতন চলছে, এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা খোদার আর্শকে প্রকম্পিত করবে আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীর আহমদীদেরকে জামাতের উন্নতি এবং যুলুম আর নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।